এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মানসিক স্বাস্থ্য ও সহিংসতা

মোঃ আমিনুল ইসলাম
মনোবিজ্ঞানী ও উন্নয়নকর্মী
ইনসিডিন বাংলাদেশ

এক সময় মানসিক সমস্যা বলতে মানসিক রোগ বা অসুস্থতাকেই বোঝানো হতো, এখন এমন ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক, সামাজিক ও শারীরিক উপাদানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তিগত, দলগত ও পরিবেশগত এমন ক্ষমতাকে বুঝানো হয় যার মাধ্যমে একজন আরেকজনের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া করতে পারে এবং এর ফলে অবস্থার উন্নতি হয়, ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ ও মানসিক ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যকে যদি একটি চলমান বিষয় হিসেবে দেখা হয়, তাহলেও স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্যের বিপরীত প্রান্তকে মানসিক রোগ বলা যায় না, তবে এ অবস্থাকে ন্যূনতম মানসিক স্বাস্থ্য বলা যায়। স্বাস্থ্যের নির্ধারকসমূহের মধ্যে একটি হলো 'মানসিক অসুস্থতা'। যে ব্যক্তির মানসিক রোগের চিকিৎসা গ্রহণের পর তার লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন এবং ব্যক্তিগত, দলগত ও পরিবেশগত উপাদানগুলোর সাথে কার্যকরভাবে আন্তঃক্রিয়া করতে পারেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে জীবন যাপন করতে পারছেন বলা যায়। আবার এ উপাদানগুলো ঠিকমত কাজ না করলে ব্যক্তিকে ন্যূনতম মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে জীবন যাপন করতে হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য সামাজিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। সামাজিক ও পরিবেশগত উপাদানের মধ্যে সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সাম্প্রতিককালে সহিংসতা একটি সামাজিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা ক্ষমতার অপব্যবহারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত (উদাহরণস্বরূপ, অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করা)।

সহিংসতা এক ধরনের আক্রমণাত্মক ও স্বেচ্ছাচারী আচরণ, যার ফলে ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত ও হেয়-প্রতিপন্ন হয় বা নেতিবাচকভাবে তাকে কোন পরিস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়। যদি ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কোন কাজ করে যা অন্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে সেটাও এক ধরনের সহিংসতা। ক্ষমতার অপব্যবহার করে একজনের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া বা কোন কাজ করতে বাধ্য করাও সহিংসতা। মানসিক স্বাস্থ্যের উপর সহিংসতা কতটুকু প্রভাব ফেলছে তা জানার বিষয়টিকে খুব কম গুরুত্বই দেয়া হয়েছে। সহিংসতার সঙ্গে ব্যক্তির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, অন্তরঙ্গতা, নির্ভরশীলতা ও বিশ্বস্ততাসহ শারীরিক, আবেগীয়, ভাষাগত, মানসিক, অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণ ও নিয়মনীতি অমান্য করার মত বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক রয়েছে। এ জন্য সহিংসতাকে এক ধরনের নির্যাতন হিসেবে দেখা হয়েছে। নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে শিশু নির্যাতন, নারী নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, প্রাপ্ত বয়স্ক কর্তৃক নির্যাতন ও অবহেলা, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নির্যাতন ও অবহেলা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি নির্যাতন, ভাই-বোন কর্তৃক নির্যাতন, সেবাদানকারী কর্তৃক নির্যাতন, পিতা-মাতা কর্তৃক কিশোর-কিশোরীদের ওপর নির্যাতন উল্লেখযোগ্য। এ নির্যাতনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সকল ধরনের সহিংসতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগসূত্র রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির ওপর সহিংসতা তাদের নিকট-আত্মীয়দের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। সকল ধরনের সহিংসতাকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়– শারীরিক, মানসিক, যৌন সহিংসতা ও অবহেলা।

সহিংসতার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ও এর প্রভাবসমূহ :

শারীরিক সহিংসতা : কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত করাই হলো শারীরিক সহিংসতা । এসবের মধ্যে রয়েছে কাউকে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া, ধাক্কা দেয়া, ঘুষি দেয়া, ছ্যাক দেয়া, লাথি দেয়া, কোন কিছু দিয়ে মারা ইত্যাদি। শারীরিক নির্যাতনের ফলে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক ও আচরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও আক্রমণাত্মক ও ভীতিমূলক আচরণ দেখা যেতে পারে।

আবেগীয় সহিংসতা : আবেগীয় নির্যাতনকে ভাষাগত নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ধরনের নির্যাতনের ফলে ব্যক্তির আচরণগত, জ্ঞানীয় ও আবেগীয় মানসিক সমস্যা হতে পারে। কোন কারণে কাউকে তুচ্ছ করা কিংবা কাছে আসতে নিষেধ করা অথবা ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা, কোন উপনামে ডাকা, তাকে দোষারোপ করা ইত্যাদি আবেগীয় নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত। আবেগীয় নির্যাতনের ফলে ব্যক্তির মধ্যে বহুরূপী ব্যক্তিত্ব সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও অস্বাভাবিক আচরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যৌন সহিংসতা : একজন ব্যক্তি যখন অন্য একজন বিপরীত বা সমলিঙ্গের ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তবে তা যৌন সহিংসতা। আর যখন সাধারণভাবে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক বা শিশুর চেয়ে বয়সে বড় এমন কেউ শিশুর সঙ্গে যৌন কাজে লিপ্ত হয়,

তাকে যৌন নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্য ব্যক্তিটি কৌশলের মাধ্যমে কিংবা কোন কিছু দেয়ার কথা বলে কাউকে যৌন কাজে নিয়োজিত করে। যৌন নির্যাতনের ফলে ব্যক্তির মধ্যে অভিযোজনমূলক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার অপরাধবোধ, নিম্ন আত্ম-সম্মানবোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ দেখা দিতে পারে।

অবহেলা : কাউকে তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করা থেকে বঞ্চিত করাই হচ্ছে অবহেলা । ব্যক্তির প্রতি অবহেলা শারীরিক, শিক্ষামূলক ও আবেগীয়ভাবে হতে পারে। পর্যাপ্ত খাদ্য, পোষাক না দেয়া, সঠিক স্বাস্থ্য সেবা না দেয়া, যথাযথ তত্ত্বাবধান না করা ইত্যাদি হলো শারীরিক অবহেলা, সঠিকভাবে বিদ্যালয়ের উপকরণ না প্রদান করা, বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে তা না দেয়া ইত্যাদি হলো শিক্ষামূলক অবহেলা, আবেগীয় সমর্থন ও ভালবাসা প্রদান না করা, কাউকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ না করা, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের কারণে শিশুর যত্ন না দেওয়া ইত্যাদি হলো আবেগীয় অবহেলা। অবহেলার ফলে ব্যক্তি নিজেকে অসহায় বোধ করতে পারে, মানসিক দূরত্ব তৈরি করতে পারে, দুর্বল আত্ম-মর্যাদাবোধ জন্ম নিতে পারে, এমনকি আত্মহত্যার মত ঘটনাও ঘটতে পারে।

সহিংসতা প্রতিকার ও প্রতিরোধে মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের করণীয় :

- সহিংসতার লক্ষণ সনাক্ত করতে হবে এবং সনাক্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- কর্মীদের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো, নির্যাতিত ব্যক্তিকে সহায়তা করা বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তার সমস্যা প্রকাশ করতে চায় না, তাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, নির্যাতনের জন্য তার কোনো দোষ ছিল না; নির্যাতনকারীই ঘটনার জন্য দায়ী।
- স্বাস্থ্য সেবাদানকারীগণ সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিগত বিষয়গুলো খুঁজে বের করবেন এবং সে অনুযায়ী সেবা প্রদান করবেন।
- নির্যাতিত ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করবেন।
- নির্যাতিত ব্যক্তির প্রতি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ও সামাজিক সহায়তা প্রদানকারী নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করবেন।
- ঝুঁকিপূর্ণ ও চাপমূলক পরিস্থিতিতে তারা কখনও সঠিক সেবা প্রদানের প্রত্যাশা করতে পারে না । তাই মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীগণ অবশ্যই সহিংসতার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।
- এককভাবে নির্যাতিত ব্যক্তির সেবা প্রদান করতে গেলে সহিংসতার পরবর্তী প্রভাব সম্পর্কে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা কৌশলগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকা দরকার।

সহিংসতা ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যকে যেমন ব্যাহত করে ঠিক তেমনি দৈনন্দিন জীবন-যাপনকেও ব্যাহত করে। সহিংসতার প্রভাব পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে না , সামাজিক পরিমণ্ডলে এমনকি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারণাও প্রয়োজন।